

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 337 - 346

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সুজাতা : ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসে এক ব্যতিক্রমী নারী

ড. শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)

সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

Email ID: sipradg70@gmail.com 0009-0002-3986-0633**Received Date 20. 01. 2026****Selection Date 10. 02. 2026****Keyword**

Middle-class,
Naxalite
Movement,
Women, Poverty,
landless, Farmer,
Transformed,
Revolutionary,
Wildfire, Society.

Abstract

Mahasweta Devi's *Sujata* is portrayed as a middle-class wife, mother, and a rebellious woman. The novel *Hajar Churashir Ma* (Mother of 1084) was first published in the autumn issue of the magazine *Prasad* in 1973. Later, after revision and expansion, it was first published in book form in 1974 by Karuna Prakashani. This novel has been translated into English, French, and Hindi. During the 1970s, Bengali literature witnessed a new turn and a fresh current, which also influenced Mahasweta Devi's writing. This novel was written against the backdrop of the Naxalite movement. The time span of the novel is limited to just one day—morning, noon, afternoon, and evening. The narrative is divided into only four chapters. Initially, there was no chapter titled 'Afternoon'; it was added later and incorporated into the novel. On one hand, the novel presents a domestic story of middle-class life, and on the other, it depicts the Naxalite movement.

In May 1967, poor peasants and tribal people of Naxalbari, under the leadership of contemporary leaders, engaged in armed struggle to seize land. The main cause of this rebellion was land ownership and the severe oppression inflicted upon farmers. The movement first began in the village of Naxalbari in West Bengal. Although it initially started as a struggle for the rights of landless peasants, it later transformed into an armed revolutionary movement. During this movement, the leadership split into two factions. Those who fought on behalf of landless farmers came to be known as Naxalites. Both the government and the Naxalites engaged in violence. Although many people were killed or injured due to this movement, it brought about significant changes in India's rural economy and society. Gradually, the movement spread like wildfire to regions such as Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Bihar, and Jharkhand. Although written against the backdrop of the Naxalite movement, Mahasweta Devi structured this novel by focusing on selected fragments of the movement and on middle-class life. However, the writer's principal aim was to delve deep into the human character and psychology of middle-class society and to uncover the true nature of the inner self.

Discussion

মহাশ্বেতা দেবীর ‘সুজাতা’ মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রী, মা ও বিদ্রোহিনী নারী। ‘হাজার চুরাশির মা’ প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় ‘প্রসাদ’ পত্রিকায় ১৯৭৩ খ্রিঃ। এই উপন্যাসটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খ্রিঃ করুণা প্রকাশনী থেকে। এই উপন্যাসটি ইংরেজি, ফরাসি ও হিন্দি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। সত্তরের দশকে বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন মোড় তথা নতুন স্রোত দেখা দিয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতেও তার প্রভাব পড়েছিল। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয় এই উপন্যাস।

এই উপন্যাসের সময়সীমা মাত্র একদিন। সকাল, দুপুর, বিকেল এবং সন্ধ্যা। মাত্র চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনীকে। প্রথমে ‘বিকেল’ নামে অধ্যায়টি ছিল না, পরে একে নতুন করে এই উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উপন্যাসে একদিকে রয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের এক ঘরোয়া কাহিনী আর অন্যদিকে রয়েছে নকশাল আন্দোলন। ১৯৬৭ সালের মে মাসে নকশাল বাড়ির দরিদ্র কৃষক ও আদিবাসীরা তৎকালীন নেতাদের নেতৃত্বে জমি দখলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল জমির মালিকানা ও কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার। প্রথমে এই আন্দোলনটি শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের নকশাল বাড়ি গ্রামে। মূলত ভূমিহীন কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য এই আন্দোলন শুরু হলেও পরবর্তীতে এটি একটি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনে তৎকালীন নেতাদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায়। ভূমিহীন কৃষকদের পক্ষ নিয়ে যারা লড়াই করে তারা নকশালপন্থী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সেখানে সরকার ও নকশাল উভয় পক্ষই সহিংসতায় লিপ্ত হয়। এই আন্দোলনের ফলে বহু মানুষ হতাহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দাবানলের মতো ছত্তিশগড়, অন্ধপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

নকশাল আন্দোলনের নেতা ছিলেন চারু মজুমদার, সুশীতল রায় চৌধুরী, কানু সান্যাল প্রমুখেরা। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ভূমি সংস্কার এবং জমি পুনর্বণ্টন করে দরিদ্র নীরহ কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া। এই আন্দোলনের পট ভূমিকায় রচিত বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘শ্যাওলা’, সমরেশ বসুর ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, অসীম রায়ের ‘গৃহযুদ্ধ’, শৈবাল মিত্রের ‘অজ্ঞাতবাস’, মহাশ্বেতাদেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’, ‘হাজার চুরাশির মা’ ইত্যাদি। আর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি হল, মহাশ্বেতা দেবী রচিত ‘দ্রৌপদী’, সমরেশ বসুর ‘শহীদের মা’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পলাতক’, বিমল কর রচিত ‘নিগ্রহ’, দেবেশ রায়ের ‘কয়েদখানা’, ইত্যাদি।

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হলেও এই আন্দোলনের খন্ডাংশ ও মধ্যবিত্ত জীবনকে ভিত্তি করে নিয়েই মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসের ছক কেটেছিলেন। যদিও মধ্যবিত্ত সমাজের বিশেষ করে মানব চরিত্র এবং মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে সত্তরের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করাই ছিল লেখিকার প্রধান লক্ষ্য। গ্রামভারতের আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসের মাধ্যমে। এছাড়া স্বাধীন ভারতের তথাকথিত জনসেবক পুলিশের সাম্রাজ্যবাদী সুলভ অকথ্য বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেছেন। দেশের আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এক বিপুল জনসংখ্যাকে অপরিসীম দারিদ্র্য, দুঃখ এবং শেষ পর্যন্ত এক বিরাট বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছে। লেখিকা ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসের মাধ্যমে দেশের তথা ভারতবর্ষের এই অসহনীয় অবস্থার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসের নায়িকা সুজাতার উচ্চবিত্ত সমাজে বিয়ে হয়েছে। দুই ছেলে, দুই মেয়ে, শাশুড়ি ও স্বামীকে নিয়ে ভরা সংসার তার। কিন্তু দুঃখের বিষয় শাশুড়ির মানসিক অত্যাচার দিন রাত সহ্য করতে হত তাকে। আর স্বামী দিব্যান্থ মেয়েদের শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তু বলেই মনে করত। সুজাতাকে স্ত্রীর মর্যাদা কোনদিনই দেয় নি। ব্রতী ছিল একমাত্র সুজাতার আদরের ধন তথা চোখের মণি। শ্রেণী সাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তার সহযোগীদের চক্রান্তে ব্রতী লাশ কাটা ঘরে পড়ে থাকে। সেই ঘরে তার নাম্বার হল ১০৮৪। সুজাতার শোক আর ব্রতীর আদর্শ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তৈরী ‘হাজার চুরাশির মা’। সুজাতা শুধু ব্রতীর মা নয়, লাশকাটা ঘরে পড়ে থাকা হাজার চুরাশি জনের মা। এই মা হয়ে উঠার করুণ কাহিনী ‘হাজার চুরাশির মা’। উপন্যাসের সময়সীমা মাত্র একদিন। সকাল দুপুর বিকেল এবং রাত। বাড়ি থেকে সুজাতার বের হওয়া, সমুর মায়ের সঙ্গে দেখা, নন্দিনীর সঙ্গে কথা, সুজাতার বাড়ীতে সদ্যমৃত ব্রতীর জন্মদিনে তার দিদির

এনগেজমেন্ট উপলক্ষে বড় পার্টি এবং সেখানেই সুজাতার মৃত্যু। পেছন ফিরে উপন্যাসের কাহিনীকে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুজাতার বত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবন কাহিনীর মধ্যে উঠে এসেছে ব্রতীর বেড়ে উঠার কাহিনী যেখানে সুজাতার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। সমুর মায়ের সঙ্গে দেখা হয় সুজাতার। সেখানে ব্রতীকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেন। তিনি জানতে পারেন ব্রতীর মতো সমুও এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু নিম্নবিত্ত সমুর মায়ের সঙ্গে উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলে ব্রতীর মায়ের অনেক পার্থক্য। সুজাতা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন সামাজিক ভেদাভেদের যে দেয়াল তিনি ইচ্ছা করলেও তা ভেঙে দিতে পারেন না। আমরা উপন্যাসের কাহিনী একটু আলোচনা করলে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো।

উপন্যাসের কাহিনীতে দেখতে পাই সুজাতা এক উচ্চবিত্ত ঘরের গৃহিনী। তাঁর চারটি ছেলে মেয়ে। স্বামী দিব্যনাথ ও বড় তিন সন্তানের সঙ্গে তাঁর কোনো মানসিক যোগাযোগ নেই। সুজাতার একমাত্র প্রাণের প্রাণ তথা নয়নের মণি ছিল তাঁর কোলের ছেলে ব্রতী। সে যেন এই বাড়ীতে গোবরে পদ্মফুল। স্বার্থপর দুর্নীতিপূর্ণ এক পরিবারে এক ব্যতিক্রমী সন্তান। সুজাতার প্রভাব হয়তো তার ছেলের মধ্যে পড়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় মা ছেলেকে অক্ষরে অক্ষরে চেনার আগেই ছেলে এ দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় নেয়। নকশালবাড়ির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক তরুণের সঙ্গে ব্রতী প্রাণ হারায়।

উপন্যাসে ব্রতীকে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন লোকের স্মৃতির মাধ্যমে। তাদের স্মৃতিচারণা থেকে সুজাতা বুঝতে পারেন, আবিষ্কার করেন ব্রতীকে। বিশেষ করে শেষ কয়েকদিন ব্রতীর সঙ্গে যারা থেকেছিল, তাদের কাছ থেকে সুজাতা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারেন অন্য আর এক ব্রতীকে। এদের মধ্যে ব্রতীর বান্ধবী নন্দিনী এবং ব্রতীর বন্ধু সমুর মা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের কাছ থেকে ব্রতী সম্পর্কে সুজাতা যে তথ্য পান তা থেকে তিনি যেন নতুন করে ছেলেকে চিনতে পারেন। সবচেয়ে যন্ত্রণা দায়ক হল ব্রতীর জন্মদিনেই তার বাড়ীর লোকেরা বড় পার্টির আয়োজন করে এবং সেখানে তারা বিশিষ্ট অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করে আনে ব্রতীর হত্যাকারী এক কুখ্যাত পুলিশ অফিসারকে। ছেলের স্মৃতিকে এমন অপমান করা সুজাতা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় সুজাতার মৃত্যু হয়। এই হল উপন্যাসের সাদামাটা কাহিনী। এই কাহিনীর অন্তরালে রয়েছে নারীর জীবনে দুঃখ। প্রথমে নীরব প্রতিবাদ তারপর সবশেষে সুজাতার বিদ্রোহিনী হয়ে যাওয়ার ঘটনা।

উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী সুজাতাকে অঙ্কন করেছেন উচ্চ মধ্যবিত্ত দৈনন্দিন জীবনের এক সাধারণ নারী চরিত্র হিসাবে। সুজাতা অন্য নারীদের মতোই চেয়েছিল স্বামী, শাশুড়ী, ছেলে মেয়েদের নিয়ে ঘর করতে। কিন্তু সেখানে প্রথমে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় শাশুড়ী। সুজাতা ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিত নারী। বাড়ির বাইরে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্বামী ও শাশুড়ী মেনে নিতে পারে নি। তারা চেয়েছিল সুজাতা সারাদিন বাড়ীতে বন্দী থেকে হেশেলের ঘানি টানুক। সুজাতার মন যে অজানাকে জানতে চায়, অচেনাকে চিনতে চায় এবং রান্নাঘরের বাইরের জগৎ তার মনকে হাতছানি দেয় তা স্বামী ও শাশুড়ী কোনো মতেই বিশ্বাস করতে নারাজ। তাই বাড়ীর বাইরে কাজ করার সুযোগ পেয়েও সুজাতা ছিলেন মানসিক ভাবে একা। তাঁর বন্দী জীবনে ব্রতী ছিল একমাত্র মুক্তির হাওয়া। তাই সুজাতা উপন্যাসের শুরুতে ব্রতীর জন্মের স্বপ্ন দেখেন। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসটি এই ভাবে শুরু করেছেন, -

“স্বপ্নে সুজাতা বাইশ বছর আগেকার এক সকালে ফিরে গিয়েছিলেন, প্রায়ই যান। নিজেই ব্যাগে গুছিয়ে রাখেন তোয়ালে, জামা, শাড়ি, টুথব্রাশ, সাবান, সুজাতার বয়স এখন তিনপ্লান্ন। স্বপ্নে তিনি দেখেন একত্রিশ বছরের সুজাতাকে, ব্যাগ গোছানোয় ব্যস্ত। সেই সুজাতার মুখ বার বার যন্ত্রণায় কুঁচকে যায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে কান্না সামলে নেন সুজাতা, স্বপ্নের সুজাতা, ব্রতী আসছে।”^১

মানুষ জীবনে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনাগুলিকে মনে রাখতে পারে না। কিন্তু কিছু কিছু স্মরণীয় ঘটনা কোনোমতেই ভুলে যায় না। স্মৃতির পাতায় তা চিরকালের জন্য অমর হয়ে থাকে। শাশুড়ী সুজাতার কাছেই ছিলেন। তিনি সুজাতার সন্তান হওয়া দেখতে পারতেন না। বরং ভয়ংকর বিদ্বেষের চোখে তাকাতে। সুজাতাকে একা রেখে সেই সময় বোনের বাড়ি চলে যেতেন। স্বামী দিব্যনাথ এই ঘটনাকে সায় দিয়ে বলতেন, -

“মা অত্যন্ত নরম, বুঝলে? তিনি এসব দেখতে পারেন না, যন্ত্রণা টন্ত্রণা-টেঁচামেচি।”^২

স্বামী দিব্যনাথ খরচপত্র দিয়ে তাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে যাওয়া যে স্বামীর পরম কর্তব্য তা মানতে নারাজ। সুজাতা ঘরে বাইরে পুরোপুরি একা। সমস্ত যত্নগণা সুজাতা সহ্য করেন দাঁতে দাঁত কামড়ে। সান্ত্বনা দেবার মতো পাশে কাউকে পাননি। লেখিকার ভাষায়, -

“ষোলোই জানুয়ারি সারারাত যত্নগণা ছিল। জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইথারের গন্ধ, চড়া আলো, আচ্ছন্ন যত্নগণার ঘোলাটে পরদার ওপারে ডাক্তারদের নড়াচড়া সারারাত, সারারাত, তারপর ভোর বেলা, সতেরোই জানুয়ারি ভোরে ব্রতী এসে পৌঁছেছিল।”^৩

ব্রতীকে সুজাতা নিজের মতো করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। অন্য ছেলে মেয়েদের প্রভাব তার উপর পড়তে দেননি। কিন্তু হঠাৎ ব্রতী বড় হতে না হতেই তার উপর কালো ছায়া ঘনিয়ে এল। আততায়ীর গুলিতে তার প্রাণ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। সুজাতার কাছে টেলিফোন আসে, -

“ব্রতী চ্যাটার্জি আপনার কে হয়? কাঁটাপুকুরে আসুন। ডু ইউ আইডেনটিফাই ইওর সান?”^৪

টেলিফোনে খবর পেয়ে দিব্যনাথ কৌশলে ব্রতীর এই মৃত্যুর খবরটা চেপে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। এই ঘটনার পর থেকেই ব্রতীর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার চেতনায় ব্রতীর বাবারও মৃত্যু ঘটে। সুজাতার চেতনায় দিব্যনাথের ব্যবহার উল্কাপাত ঘটায়। লেখিকার ভাষায় বলা যায়, -

“দিব্যনাথের সেদিনের ব্যবহারের ফলে, দিব্যনাথ জানেন না, সুজাতার চেতনায় তিনি মরে গেছেন। অবশেষে সরে গেলেন বহুদূরে। সুজাতার পাশেই শুয়ে থাকেন দিব্যনাথ। কিন্তু জানতে পারেন না মৃত ব্রতীর চেয়ে জীবিত দিব্যনাথের মানসম্মানের কথা, নিরাপত্তার কথা ভেবেছিলেন সেদিন। তাই সুজাতার কাছে তিনি অনস্তিত্ব হয়ে গেছেন।”^৫

দিব্যনাথ নিজের মন থেকে ব্রতীকে একবারে মুছে দিয়েছেন। কিন্তু সুজাতা তা পারেন নি। কারণ তিনি যে মা, শুধুই মা। মায়ের কোনো বিকল্প নেই। শয়নে স্বপনে ব্রতী সুজাতার কাছে এসে ধরা দেয়। সেই মুক্তির দশকে একহাজার তিরিশিজন মৃত্যুর পরে চুরাশি নম্বরে ওর নাম। ব্রতীকে তিনি কোনো ভাবেই ভুলতে পারেন না। তিনি স্বপ্নে দেখেন তিন বছরের ব্রতী তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরে কতবার করে কেঁদে কেঁদে বলে যে মা তুমি আজ শুধু আজ অফিসে যেও না, আমার সঙ্গে থাক। এ যেন মধ্যবিত্ত ঘরের প্রতিটি মায়ের কাছে তার সন্তানের আকুল প্রার্থনা। বিপ্লবী ছেলে দিব্য নাথের সুনাম বা খ্যাতি স্বার্থের হানি করে কিনা এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সুজাতা ব্রতীর মৃত্যুতে একা হয়ে যান ঠিকই কিন্তু মনের মধ্যে একটা তীব্র জোর পান। এই ঘটনার পর থেকে সুজাতা প্রথম স্বামীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ ছিল নীরব। ধীরে ধীরে তা সরব বিদ্রোহে পরিণত হয়। বিবাহ বন্ধন ছিল না করলেও সংসারের মধ্যে ব্রতীকে নিয়ে তিনি আলাদা জগৎ গড়ে তোলেন। স্বামী ও অন্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে থেকেও তিনি একা, একেবারেই একা।

সুজাতার প্রথম সন্তান জ্যোতি। সে ছিল দিব্যনাথের অনুগত ও বাধ্য ছেলে। বিনির সহৃদয় স্বামী, সুমনের স্নেহময় পিতা। জ্যোতি ব্রিটিশ নামাঙ্কিত ফর্মের মেজসাহেব। নীপা, বড়ো মেয়ের বর কাস্টমসের বড়ো অফিসার। ছোট মেয়ে তুলি যাকে বিয়ে করছে, সেই টোনি কাপাডিয়া নিজে এজেনসি খুলে সুইডেনে ভারতীয় সিন্ধু বাটিক, কাপেট, পেতলের নটরাজ ও বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া পাঠায়। জ্যোতির শ্বশুর, শাশুড়ি বিলাতেই থাকেন।

আর ব্রতী ছিল একেবারেই অন্যরকম, যাকে বলে মা কা ব্যাটা। সে এই নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। ব্রতীর হয়তো মনে হয়েছিল, যে পথ ধরে এই রাষ্ট্র ও সমাজ চলছে সে পথে মুক্তি আসবে না। অপরাধের মধ্যে ব্রতী শুধু শ্লোগান লেখেনি, শ্লোগানে বিশ্বাস করেছিল। ফলে ব্রতী সমাজ বিরোধী হিসাবে তার বাবা ভাইদের কাছে নাম লেখায়। সে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সমু, বিজিত, পার্থ আর লালটুকে সাবধান করবার জন্যেই ষোলোই জানুয়ারি নীল শার্ট পরে সুজাতার চোখে শেষ বারের মতো মায়া লাগিয়ে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সতেরোই জানুয়ারি তার লাশ কাঁটাপুকুরে পড়ে থাকে। রাত হলে পুলিশি হেফাজতে গাদাই হয়ে শ্মশানে আসে। তারপর সবার সঙ্গে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

ব্রতী যদি বড় ছেলে জ্যোতির মতো প্রচুর মদ খেতো, নীপার স্বামীর মতো মদ খেয়ে মাতলামি করতো তাহলে ব্রতীকে তারা অন্য রকম দেখতো না। ব্রতীর বাবা দিব্যানাথের মদ খাওয়া এবং মেয়েদের নিয়ে বাইরে চলাচলি করা ছিল নিত্য দিনের ঘটনা।

সুজাতা তাঁর স্বামী, ছেলে, মেয়ে এবং মেয়ের জামাই সবার জঘন্য নোংরামি দেখে মন খারাপ করেননি। মনকে সবসময় সাঙ্কনা দিয়েছেন এই মনে করে যে, সবাই তো সুখী হয় না। কাউকে তিনি কোনোদিন এই ব্যাপারে প্রশ্ন করে ননি। তাঁর যে নৈতিক অধিকার আছে স্বামীকে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করার তা সুজাতার জানাই ছিল না। এ যেন মধ্যবিত্তের প্রতিদিনের ঘটনা। সুজাতার স্বামী দিব্যানাথ চিরকাল মেয়েদের সঙ্গে নোংরামি করত তাতে মায়ের মদত ছিল একশ শতাংশ। সুজাতার শাশুড়ি মনে করতো পুরুষ মানুষের এটা করা কোনো অপরাধ নয়। তাই তাতে তাঁর সম্মেহ প্রশয় ছিল। একা ব্রতীর জন্য সুজাতা স্বামীকে ও শাশুড়িকে অমান্য করেছেন। অর্থহীন শাসন আর স্বৈচ্ছাচারী প্রশয় ব্রতীকে ভোগ করতে দেন নি যা অন্য ছেলেমেয়েরা অনায়াসে ভোগ করেছে।

স্বামী ও শাশুড়ির আধিপত্যের উত্তাপ থেকে ব্রতীকে আলাদা করে রাখার জন্য সুজাতাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। ব্রতীর অকালে চলে যাওয়া সুজাতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি ব্রতীকে খোঁজ করার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। ব্রতী যার সঙ্গে বেশী থাকত, চলত, ঘুরাঘুরি করত তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সকাল সন্ধ্যা তাদের কাছে ছুটে যেতেন। ব্রতীর জন্মের পর থেকেই স্বামী দিব্যানাথের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় না থাকার মতোই। তাই রঙিন শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছেন। লেখিকার ভাষায় বলা যায়, -

“সুজাতা নিজে কোনোদিনই হাতে সরু বাল্লা, কানে ফুল, গলায় একটা সরু হার ছাড়া কিছু পরেন না।”^৬

সোনার জিনিষ যা ছিল তা ছেলে মেয়েদের ভাগ করে দিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় সুজাতা মনে প্রাণে স্বামী থেকেও না থাকার মতোই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তার প্রমাণ আমরা উপন্যাসে অনেক জায়গাতে পাই। এই উপন্যাসের ‘দুপুর’ অংশে ব্রতীর বন্ধু সমুর মার সঙ্গে দেখা করতে যখন গেছেন তখন সমুর মায়ের মুখে শুনতে পাই,

“সুজাতার দামি সাদা শাড়ি, অভিজাত চেহারা, কাঁচাপাকা চুল ঘেরা শ্রৌচ মুখের বনেদিয়ানা দেখে সমুর মা হতভম্ব হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন।”^৭

দিব্যানাথ সুজাতাকে প্রথম তিন ছেলেমেয়ের ব্যাপারে সাধারণতম অধিকারও খাটাতে দেন নি। সব তাঁর মা-র হাতে ছিল। স্ত্রীকে পদানত না করেও মাকে সম্মান দেওয়া যায় তা দিব্যানাথ জানতেন না। স্ত্রীকে পদানত রাখবেন, মাকে রাখবেন মাথায়। এই ছিল তাঁর নীতি। এ যে মধ্যবিত্ত পরিবারের বেশীর ভাগ পরিবারের মূল কথা। মা মায়ের জায়গায় থাকবে, স্ত্রী থাকবে স্ত্রীর জায়গায়। দুজনকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। এই কথা তাদের জানার বাইরে ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবস্থায় বৌ আর শাশুড়ির মধ্যে এই চিরন্তন পার্থক্যকে মহাশ্বেতা দেবী নিপুন ভাবে তুলে ধরেছেন।

সুজাতা সংসারে চুপচাপ থাকলেও তাঁর আত্মসম্মান ও অভিমান ছিল খুব বেশী। বিয়ের পরেই তিনি বুঝেছিলেন সংসারে তিনি নিজেকে যত লুকিয়ে তথা নেপথ্যে রাখবেন তাতেই সংসারের অন্যরা অর্থাৎ স্বামী ও শাশুড়ি সুখে থাকবে। কারণ স্বামী দিব্যানাথ ও তার মা একই নীতিতে বিশ্বাসী। পুত্রবধূকে কিছুতেই মর্যাদা দিতে চায় না। ছেলেমেয়ে নিয়ে করিয়ে আনা হয় একমাত্র রাঁধুনি হিসাবে অর্থাৎ রান্নাঘর সামাল দেয়ার জন্য। তাই সুজাতার পক্ষে জ্যোতি, তুলি ও নীপা কেউই ছিল না। তারাও বাবা ও ঠাকুরমার দলেই ছিল। দিব্যানাথ কোনোদিন সুজাতার অন্তরের গহনে প্রবেশ করেন নি বা তাঁর চাওয়া পাওয়ার দিকে নজর দেন নি। দিব্যানাথ সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্য -

“স্ত্রী স্বামীকে স্বাভাবিক নিয়মে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, মানে। স্বামীকে স্ত্রীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আনুগত্য পাবার জন্যে কোনো চেষ্টা করতে হয় না। দিব্যানাথ মনে করতেন বাড়ি করেছেন, চাকরবাকর রেখেছেন, যথেষ্ট কর্তব্য করেছেন। বাইরে মেয়েদের নিয়ে চলাচলি করার কথা গোপন করতেও চেষ্টা করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর সব অধিকারই আছে।”^৮

দিব্যনাথের এই ধারণা কত যে ভ্রান্ত ছিল তা পাঠক সমাজের বুঝতে অসুবিধা হয় না। নারী যদি একটু ভালবাসা পায় তাহলে সে স্বর্গের দ্বার খুলে দিতে পারে। নারীর মনকে পুরুষ কোনো গুরুত্বই দিত না। দিব্যনাথ আবার বিবেচক ছিলেন। তাই তাঁর ফার্মে যখন মোটা অংকের টাকা আসতে শুরু করে তখন সুজাতাকে চাকরী ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু সুজাতা তাতে কোনো কর্ণপাত করেন নি। এটা ছিল স্বামীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিদ্রোহ। স্বামীর সঙ্গে প্রথম বিদ্রোহ সুজাতা ব্রতীর দুই বছর বয়সে করেন। দিব্যনাথ কিছুতেই সুজাতাকে নিজের বশে আনতে পারেন নি। অর্থাৎ পঞ্চমবার 'মা' হতে বাধ্য করতে পারেন নি।

দিব্যনাথ বাইরের মেয়েদের সঙ্গে সাহচর্য করতেন। এই কথা ব্রতী জানত। কথা প্রসঙ্গে ব্রতী তার মাকে এই কথা বুঝিয়ে দিয়েছিল। সুজাতা তখন লজ্জায় অবনত মস্তকে সব কিছু সহ্য করতেন। সুজাতার অসুখ করলে ব্রতীই ছিল তার একমাত্র ভরসা। ব্রতী ছোট বেলা থেকেই মায়ের ছায়া সঙ্গী ছিল। সে খেলা ছেড়ে মাকে সেবা করার জন্য চলে আসত। ব্রতীর এই রকম কাজ কর্ম দিব্যনাথ মেনে নেয় নি। দিব্যনাথ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বলতেন, -

“মিলক সব। মেয়ে মার্কী ছেলে। নো ম্যানলি নেস।”^{১৮}

কিন্তু ব্রতীই ঠিক ছিল। আচারে ব্যবহারে এমনকি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল ব্রতী কত সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিল।

মধ্যবিত্ত সমাজে একজন শিক্ষিত নারী যেমন হয় সুজাতা ঠিক তেমনই ছিল। কিন্তু দিব্যনাথ সুজাতাকে বুঝতে বা চিনতে পারেন নি। সুজাতা উগ্র স্বাধীনচেতা মহিলা নন, আবার ফ্যাশনেবল চাকরি করে বলে গাড়ি চালিয়ে কলকাতা চষে বেড়াবেন তাও নন। একেবারেই শান্ত স্বল্পভাষী মহিলা ছিলেন। পোশাকে পরিচ্ছদেও তেমন চাকচিক্য ছিল না। একেবারেই সাদা মাটা। বাড়ির গাড়ি না পারতে চড়েন। ট্রামে চড়ে ব্যাঞ্চে যায়। আবার ট্রামে করেই বাড়ি ফেরেন। বাড়ি থেকে বের হন না। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ততটা যোগাযোগ রাখেন না, বা তেমন অন্তরঙ্গতা নেই। বাড়ি ফিরে একটু বই পড়েন, টবের গাছে জল দেন। ছোটো ছেলেকে কাছে পেলে একটু গল্প করেন। এই রকম স্বভাবের নারী স্বামী সোহাগিনী হবেন এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তা আর হল না। সুজাতার নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত, হতাশার দলেই রয়ে গেলেন। স্বামী তাঁর কোন মূল্যই দিতে পারলেন না। ধন পেয়েও হারালেন।

ব্রতী তার বাবাকে 'বস' বলেই আড়ালে ডাকতো। কারণ সে ছোট থেকে তার বাবার মুখে বহুবার শুনেছে -

“আমি এ বাড়ির বস্। আমি যা বলব তাই হবে এ বাড়িতে।”^{১৯}

ব্রতী তার বাবার কাছ থেকে সব সময় দূরে দূরে থাকতো। তাই তাঁকে 'দিব্যনাথ চ্যাটার্জী' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। তার কাছে বাবা ঘৃণার চেয়ে বেশি ঔদাসীনি্যের পাত্র ছিল। ব্রতী তার বাবা সম্পর্কে বলতো -

“দিব্যনাথ চ্যাটার্জীর একক ব্যক্তি হিসেবে আমার শত্রু নন। উনি যে সকল বস্তু ও মূল্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলোতে অন্য বহুজনও বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ যারা লালন করছে, সেই শ্রেণীটাই আমার শত্রু।”^{২০}

উনি সেই শ্রেণীরই একজন। সুজাতা তাঁর স্বামীকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ ও অশ্রদ্ধা করলেও ব্রতীর মত করে এমন গভীর ভাবে ভাবেন নি। ছেলের চিন্তাধারা অনেক উপরের ছিল যা সুজাতার কাছে একেবারেই অপরিচিত। তাই সুজাতা বুঝতে পারছিলেন ব্রতী তাঁর থেকে ধীরে ধীরে অচেনা, অজানা হয়ে যাচ্ছিল। এই অজানা অচেনা ছেলেকে নতুন করে আবিষ্কার করার জন্যই ছেলের মৃত্যুর পর তার অনুসন্ধান বেরিয়েছেন এবং অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন। ব্রতী যেন আরও নতুন নতুন ভাবে মা সুজাতার কাছে ধরা দিয়েছে। তাই সুজাতা ঘুমের ঘোরে হাত ধরে টেনে আনতে চান ব্রতীকে। আকুল কণ্ঠে বলতে চান, 'ফিরে আয় ব্রতী'।^{২১}

উপন্যাসে ব্রতীকে আমরা দেখি না। সে ফুটে ওঠে অন্যদের স্মৃতির মাধ্যমে। তার প্রিয় বান্ধবী নন্দিনী, তার সহযোদ্ধা সমুর মা, সর্বোপরি তার নিজের মা। ব্রতী শুধুমাত্র তার মায়ের প্রভাবে অন্য পাঁচটা মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়েছিল। উপন্যাসের সময়সীমা একদিন। সকল, দুপুর, বিকেল এবং রাত। বাড়ি থেকে সুজাতার বের হওয়া, সমুর মায়ের সঙ্গে দেখা, নন্দিনীর সঙ্গে কথা, সুজাতার বাড়িতে সদ্যমৃত ব্রতীর জন্মদিনে কৌশল করে ব্রতীর দিদির এনগেজমেন্ট

উপলক্ষে পার্টি এবং সেখানেই সুজাতার মৃত্যু। সিনেমার ফ্ল্যাশ ব্যাকের মত দেখানো হয়েছে ব্রতীর অতীত, সুজাতার বত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবন, সবই চেতনার মাধ্যমে। সুজাতার চেতনা, কারণ তিনি হলেন কাহিনীর কেন্দ্র বিন্দু, তাঁর আত্মসমাহিত দুঃখের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে সমু-র মায়ের বুক ফাটা কান্না আর একদিকে সমাজ সম্পর্কে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। উপন্যাসটিকে পেছন ফিরে তেরী করা হয়েছে। ব্রতীর তিল তিল করে বেড়ে ওঠার কাহিনী একদিকে যেমন আছে অন্যদিকে তেমনি রয়েছে সুজাতার দুঃখ সুখের বত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের করুণ কাহিনী। ব্রতীর মৃত্যুর পর তার বন্ধু সমুর মায়ের কাছ থেকে ব্রতীর খবরাখবর নিতে গিয়ে সুজাতা যেন সত্যি সত্যি আরেক অন্য ব্রতীকে অবিস্কার করেন। ব্রতীর সঙ্গে তার বন্ধু সমু প্রাণ হারিয়েছিল একই কারণে। লেখিকার ভাষায় বলা যায়, -

“এই করেই মরেছিল ওরা। বহুজনকে বিশ্বাস করে। যাদের বিশ্বাস করেছে তাদের কারো কারো কাছে চাকরি, নিরাপত্তা, সুখী জীবনের প্রলোভন বড়ো হতে পারে তা ব্রতীরা বোঝে নি। বোঝে নি, প্রথম থেকেই বহুজন ওদের ফাঁস করে দেব বলেই দলে ঢোকে। ব্রতীর বয়স কম ছিল। একটা বিশ্বাস ওকে, ওদের অন্ধ করে দিয়েছিল। ওরা বোঝেনি যে ব্যবস্থার সঙ্গে ওদের যুদ্ধ, সে ব্যবস্থা জন্মের আগেই বহুজনকে ভ্রুণেই বিষাক্ত করে দেয়।”^{১০}

ব্রতীর মতো সমুও দুনিয়া থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু নিম্নবিত্ত সমুর মা আর উচ্চবিত্ত ব্রতীর মায়ের মধ্যে যে সামাজিক দূরত্ব তা সমস্ত চোখের জলও মুছে দিতে পারে না। সমুর মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সুজাতা ব্রতী সম্পর্কে আরও নিখুঁত ধারণা পান। এ যেন সত্যিকার অর্থেই ছেলেকে আরও কাছে পাওয়া। প্রিয় মানুষ যখন দূরে চলে যায় সে যে আরও বেশী করে প্রিয় হয়ে ওঠে। সুজাতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সমুর মা ব্রতী সম্পর্কে বলে, -

“দিদি, ব্রতীর হাসিখান আমার চক্ষে ভাসে গো! সোনার কান্তি পোলা আপনার।”^{১১}

ব্রতী তাঁর পরাণের পরাণ। যাকে জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর প্রাণ সংশয় হয়েছিল, যে তাঁর কাছে ক্রমশ অব্যবহৃত হয়ে গিয়েছিল, অচেনা, তার সঙ্গে সুজাতার যেন নতুন করে পরিচয় শুরু হয় সেই মুহূর্ত থেকে।

নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার পর সুজাতা তাঁর আদরের ধন ব্রতী সম্পর্কে আরও অনেক কিছু নতুন অজানা তথ্য আবিষ্কার করেন। ব্রতীর প্রিয় বাস্ববী ছিল নন্দিনী। ব্রতীর মৃত্যুতে নন্দিনী একেবারে ভেঙে পড়েছে। নন্দিনীর কথাতেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, -

“আমি আর ব্রতী শুধু কথা বলতে বলতে কতদিন শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর হেঁটে ফিরেছি। তখন যা দেখতাম, মানুষ, বাড়ি, পথের নিয়ম, ফুটপাতে ফেরিওয়ালার কাছে লাল গোলাপ, পথের ধারে ফেসটুন বাসস্টপে সাঁটা খবরের কাগজ - মানুষের মুখে হাসি পথের দোকানে কোনো লিটল ম্যাগাজিনে কোনো কবিতার সুন্দর ইমেজ যখন ময়দানে টিভিতে জনতার হাততালি - হিন্দি গানের সুন্দর সুর শুনতাম, আমাদের কী তীব্র আনন্দ হত আনন্দ ধরে রাখা যেত না, উই ফেলট্ এক্স ক্ল্যাসিভ। ফেল্ট লয়াল টু অল অ্যান্ড এভরিথিং- সে মন আর ফিরে আসবে না, আর ফিরে পাব না আমি। কোনোদিন ফিরে পাব না। টোটাল লস্, একটা। এরা সত্যিই শেষ হয়ে গেছে। সেদিনের আমি মরে গেছি।”^{১২}

জেলে বন্দী অবস্থায় থাকতে থাকতে নন্দিনীর চোখ অন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার ছেলে জেলে বন্দী। কেউ একটি কথাও বলতে পারে না তাদের বিরুদ্ধে। ব্রতী কথা বলেছিল বলেই অন্যায়ভাবে তাদের মারা হয়েছিল। আনন্দ্য বিট্টে করেছিল। অনিন্দ্যকে বিশ্বাস করেছিল ব্রতী। আর তাতেই সবাই ধরা পড়েছে আর সর্বনাশ হয়েছে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে দেখি তুলির এনগেজমেন্ট উপলক্ষে বাড়ীতে অনেক অতিথির আনাগোনা। দিব্যনাথ দামি পাঞ্জাবী, নতুন জুতো, নতুন গেঞ্জী পরেছে। এই সব দেখে সুজাতা আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারলেন না। তাঁর স্বামীকে বলে উঠলেন -

“ঘেন্না করছে, ভয়ানক ঘেন্না করছে। দিব্যনাথ আর টাইপিস্ট মেয়ে।”^{১৩}

চৌত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে সুজাতা একবারও এভাবে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন নি। সুজাতা মনে মনে সংকল্প করলেন,-

“আজকের পর সুজাতা থাকবেন না। আর থাকবেন না। যেখানে ব্রতী নেই সেখানে থাকবেন না।”^{১৪}

তিনি ভেবেছিলেন তুলির বিয়ের পর অপারেশন করাবেন। কিন্তু এখন দেখলেন যে, বিয়ের আগেই করাতে হবে। ছেলের মৃত্যু দিনে মেয়ের বিয়ের এনগেজমেন্টের দিন ঠিক করা কোনোমতেই ঠিক হয়নি। সবাই খুব জমকালো রঙীন পোষাক পরেছে আর সুজাতা আলমারী থেকে বেছে নিয়ে সাদার ওপর সাদা বুটিকের কালো পাড় ঢাকাই শাড়ি বার করে পরলেন। সুজাতা এই অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এটাই তার বড় প্রমাণ। অনুষ্ঠানের দিন মেয়ে, মেয়ের জামাই, নিজের স্বামী দিব্যানাথের আচার ব্যবহার দেখে সুজাতা স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, -

“সব যেন কীটদুষ্ট, ব্যাধি দুষ্ট, পচাধরা, গলিত ক্যানসার। মৃত সম্পর্কের জের টেনে মৃত মানুষেরা বেঁচে থাকার ভান করছে। সুজাতার মনে হল অমিত, নীপা, বলাই এদের গায়ের কাছে গেলেও বোধহয় শবগন্ধ পাওয়া যাবে। এরা ভ্রুণ থেকেই দুষ্ট, দুষিত, ব্যাধিগ্রস্ত। যে সমাজকে ব্রতীরা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল সেই সমাজ বহুজনের ক্ষুধিত অন্ন কেড়ে নিয়ে এদের সযত্নে রাজভোগে লালন করে, বড়ো করে। সে সমাজে জীবনের অধিকার মৃতদের, জীবিতদের নয়।”^{১৮}

অনুষ্ঠানে সবার মদ খাওয়া, ঢলাঢলি করা নিজের চোখে সুজাতা যেন আর নিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত মিঃ কাপাড়িয়া যখন সুজাতাকে হুইসকি অফার করল তখন সুজাতার তলপেটের ব্যথা ধীরে ধীরে বেড়ে চলছে। এর মধ্যে কে যেন ভি আই পি গাড়ী চড়ে তাদের পার্টিতে যোগ দিতে এসেছে তাকে বরণ করে আনার জন্য সুজাতার ডাক পড়ে। গাড়ীর সামনে গিয়ে সুজাতার চোখ যেন চড়ক গাছ হয়ে গেছে। গাড়ীর ভিতরে সাদা নিখুঁত পোশাক। পেতলের ব্যাজ। ডি. সি. ডি. ডি সরোজ পাল। সুজাতা তাকালেন, সরোজ পাল তাকাল হাজার চুরাশির মা, ব্রতী চ্যাটাজীর মা। সুজাতা এটা আর মেনে নিতে পারলেন না। সুজাতার কাছে সব অন্ধকার মনে হল। লেখিকার ভাষায়, -

“দুলছে, সব দুলছে ঘুরছে নড়ছে। শবদেহগুলোকে যেন নাচাচ্ছে। শবদেহ শত্টিত শবদেহ সব।”^{১৯}

সুজাতার শরীর আছড়ে পড়ল। দিব্যানাথ চৌঁচিয়ে উঠলেন, -

“তবে অ্যাপেনডিক্স ফেটে গেছে।”^{২০}

ব্রতীর জন্মদিনে তার বাড়ির লোকেরা পার্টি দেয় এবং সেখানে তারা বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করে আনে ব্রতীর হত্যাকারী এক কুখ্যাত পুলিশ অফিসার সরোজ পালকে। ছেলের স্মৃতিকে এত বড় অপমান করা সুজাতা আর সহ্য করতে পারলেন না। অ্যাপেনডিক্স ফেটে যাওয়ার এই প্রতীকীতেই ধরা পড়ে সুজাতার আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। মৃত্যুই শ্রেয়। এত বড় অন্যায্য কাজ যারা করতে পারে তাদের সঙ্গে বন্ধন চিরতরের জন্য ছিন্ন করে দেওয়ায় ভাল।

‘হাজার চুরাশির মা’ মহাশ্বেতা দেবী রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি লেখার পেছনে তাঁর অনেক পথ হাঁটার দিনলিপিকে অস্বীকার করা যায় না। প্রাত্যহিক জীবনকে কোনোমতেই এড়িয়ে যাওয়া নয়। তাকে তিলে তিলে উপলব্ধি করতে হয়। এই অনুভবের ইতিহাস লেখিকার এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। তাই তিনি সহসা যেন আবিষ্কৃত হলেন মধ্যবিত্তের আঙিনায়। এই আবিষ্কারের কারণ হল বাঙালী পাঠক তখন বিশেষ করে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। এখান থেকে পালানোর রাস্তা ছিল না। তার ঘরের সামনে তাজা বোমা, পুলিশ, ঘরের যুবকদের হাতে লেখা পোস্টার ‘সত্তরের দশক মুক্তির দশক’। তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু হার মানতে নারাজ। তাই তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই উপন্যাসে বর্ণিত ব্রতী যেন প্রত্যেক ঘরের সন্তান। তার মধ্য দিয়েই তারা খুঁজে পাচ্ছিলেন তাদের স্বজনের প্রতিচ্ছবি। এই ভাবেই মহাশ্বেতা দেবী আবিষ্কৃত হলেন মধ্যবিত্ত সমাজের চেনা ঘরোয়া অন্দরমহলে। কৃষিজীবী নিরন্ন মানুষের সংগ্রাম মধ্যবিত্ত সমাজকে স্পর্শ কতে পারেনি কখনও। কিন্তু নকশাল আন্দোলনে মধ্যবিত্ত সমাজ প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়েছে। কারণ প্রায় প্রতি ঘরের ছেলেরা এতে জড়িত তাই চুপ করে বসে থাকা যায় না। পেশাদারী সাহিত্যিকরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী অবশ্যই ব্যতিক্রমী লেখিকা। এই বিষয়ে তাঁর একটি মন্তব্য এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, -

“এই আনইনভলভমেন্ট এক ক্ষমার অযোগ্য অবিবেকী পাপ। যখন সৈন্য, সি. আর. পি প্রশাসনী মস্তানরা দেশকে এক রক্তাক্ত বধ্যভূমি করে আইন ও শৃংখলা পুনর্বাসিত করল, তখনও সবাই চুপচাপ। সত্তরের দশককে আমি এই ভাবে ভাবতে পারি, সেই অসামান্য সময় লেখকদের কি দিয়েছিল, আমরা তার

কাছে কি নিলাম, তাকে কি দিলাম এবং কোথায় আমাদের ব্যর্থতা। কোনো লেখক কি লিখেছেন, কেমন লিখেছেন, কখনোই সেখানে সত্তর দশকের ব্যাপার ফুরায় না। কেননা সত্তরের দশকে যাঁরা লিখেছেন বিপক্ষে, তাঁরা স্পষ্টতই অন্য শিবিরের লোক, এই দশকে প্রতিষ্ঠিত পেশাদারী শিবিরের মধ্যে সম্ভবত আমি ছিলাম অরাজনীতিক। বলা হয় আমি ঘোর রাজনীতিক লেখক। কিন্তু আমি মনে করি লেখক হিসেবে আমি সময়টির প্রাপ্য দালালিকরণে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি মাত্র।”^{২১}

‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসে সুজাতা ছিলেন নিতান্ত অরাজনীতিক ঘরোয়া মহিলা। সংসার, চাকরি, ছেলে মেয়ের জন্ম দেওয়া ইত্যাদি সাংসারিক কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকা আর দশটা মধ্যবিত্ত মায়েদের মতো এক মা। ব্রতী কী ভাবে হাজার চুরাশি হয়ে গেল? সুজাতা কীভাবে হাজার চুরাশির মা হয়ে গেলেন এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন সমুদ্র মায়েদের কাছে, ছুটে গেছেন নন্দিনীর কাছে। সুজাতা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছেন এক সমাজসচেতন, রাজনীতিক চেতনা সম্পন্ন হাজার চুরাশির মা হিসাবে। তাই এই উপন্যাস এক রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় দীর্ঘ সময়ের দলিল। যে সময়ে হাজার হাজার মায়েদের বুক খালি হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী জীবনকে বিচার করেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। তিনি মানুষকে দেখে দেখে মানুষের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের পরিচয় চিনেছেন ও বুঝতে পেরেছেন যে মানুষ রক্তমাংসে গড়া এক জীব। নানা উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে ভঙ্গুর পথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত চেহারাটাকে চিনতে পারেন। সচেতন অভিজ্ঞতায় শ্রেণী ও সমাজকে যথাযথ চিহ্নিত করতে তাঁর ভুল হয় না। এই তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা তাঁর সমস্ত লেখার প্রেরণা ও ভিত্তিভূমি। সেই দিক থেকে ‘হাজার চুরাশির মা’ একেবারেই সার্থক উপন্যাস। আর সুজাতা উপন্যাসে প্রকৃত অর্থেই ব্যতিক্রমী এক অসাধারণ নারী।

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১১
২. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১১
৩. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১২
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১৩
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১৪
৬. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২৭
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২৭
৮. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩২
৯. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩,
১০. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২ মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩১

১১. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩৩
১২. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩৫
১৩. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২৯
১৪. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২৮
১৫. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৪৭
১৬. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৫৫
১৭. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৫৫
১৮. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৬৬
১৯. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৭২
২০. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনাসমগ্র - অষ্টম খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৭২
২১. সত্তরের দশক ও তার পরে অনুষ্ঠান ১৬ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৯৮১, পৃ. ১